দ্য ওয়ার অন দি উইঘুরস

পূর্ব-তুর্কিস্তানে চীনের ঔপনিবেশিক আগ্রাসন এবং উইঘুর
মুসলিমদের ওপর জাতিগত নিধনের নির্মম ইতিহাস

আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড সিরিজ : ০২

দ্য ওয়ার অন দি উইঘুরস

পূর্ব-তুর্কিস্তানে চীনের ঔপনিবেশিক আগ্রাসন এবং উইঘুর মুসলিমদের ওপর জাতিগত নিধনের নির্মম ইতিহাস

মূল: শন আর. রবার্টস

অনুবাদ: আশফাক রেশাদ

সম্পাদনা: মোস্তফা আল হোসাইন আকিল

নতুন প্রজন্মের প্রকাশনা
ইন্তিফাদা
বুকস

আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড সিরিজ : ০২

দ্য ওয়ার অন দি উইঘুরস

পূর্ব-তুর্কিস্তানে চীনের ঔপনিবেশিক আগ্রাসন এবং উইঘুর মুসলিমদের ওপর জাতিগত নিধনের নির্মম ইতিহাস

মূল: শন আর. রবার্টস

অনুবাদ: আশফাক রেশাদ

সম্পাদনা: মোস্তফা আল হোসাইন আকিল

প্রচ্ছদ
খন্দকার যুবাইর

বানান
মুহাম্মাদ নাফিস নাওয়ার

পৃষ্ঠাসজ্জা
শাহরিয়ার হাসান

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রকাশক
আবদুর রহমান আদ-দাখিল

প্রকাশনা
ইন্তিফাদা বুকস

পরিবেশনা
ফাউন্টেন পাবলিকেশন্স

বিক্রয়কেন্দ্র: দোকান নং ২১, কওমি মার্কেট (১ম তলা,)
৬৫/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন: +৮৮০ ১৭৬৮-৮৬৪৪২৮ (সেলস)
+৮৮০ ১৭১৬৭-৯৭৫৪৯ (অফিস)

অনলাইন পরিবেশক
rokomari - wafilife

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৬০-৩-৯

মুদ্রিত মূল্য
৩২০৳

সূচিপত্র

প্রকাশকের কথা ৭

সম্পাদকের বাণী ৯

অনুবাদকের অভিব্যক্তি ১০

ভূমিকা ১২

লেখকের কথা ১৫

শুরুর কথা ১৯

প্রথম অধ্যায়

কলোনিয়ালিজম (১৭৫৯-২০০১) ২৩

দ্বিতীয় অধ্যায়

উইঘুর এবং 'সন্ত্রাসী হুমকি' ৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

ইস্ট-তুর্কিস্তান ভিত্তিক বিদ্রোহী গোষ্ঠী ৭৩

চতুর্থ অধ্যায়

কলোনিয়ালিজম এবং কাউন্টার টেরোরিজম (২০০২-২০১২) ৯৩

পঞ্চম অধ্যায়

সেলফ-ফুলফিলিং প্রফেসি এবং পিপল'স ওয়ার অন
টেরর (২০১৩-২০১৬) ১০৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

কালচারাল জেনোসাইড (২০১৭-চলমান) ১৩৩

উপসংহার ১৬১

শেষ কথা ১৬৭

প্রথমে তারা উইঘুরদের জন্য এসেছিল ১৬৭

পরিশিষ্ট

চীন: প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান ১৭১

প্রকাশকের কথা

মধ্য এশিয়া। সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক অনন্য লীলাভূমি। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও উৎকর্ষ-উদ্ভাবনের ঐতিহাসিক প্রাণকেন্দ্র। একসময়ের প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর বোখারা-সমরখন্দ ও কাশগড়ের নাম শুনলে বিষাদময় নস্টালজিয়ায় ভরে যায় চারপাশ। ইসলামি জ্ঞানকাণ্ডের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার যে নথিবদ্ধ রূপ আজ আমাদের সামনে রয়েছে, তার প্রায় সিংহভাগ বলতে গেলে এইসব অঞ্চলের মনীষীদের কীর্তিগাথা। জ্ঞানের সকল শাখার মহাপুরুষদের খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হয় এই ভূখণ্ডে। কিন্তু আজ? সবকিছুই যেন দুঃস্বপ্ন! এক দিকে রাশিয়া, অপরদিকে চীন—দুই আগ্রাসি শক্তির মরণকামড়ে নিভে গেছে টিমটিম করে জ্বলতে থাকা জ্ঞানের সকল প্রদীপ। কবরস্থ করা হয়েছে ইতিহাস-ঐতিহ্যের শেষ চিহ্নগুলোও।

মধ্য এশিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ নগরী ছিল পূর্ব তুর্কিস্তান; কাশগড় ছিল যার নাভিমূল। ঐতিহাসিক সিল্করুটের এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে কাশগড়ের অবস্থান এই নগরীকে করেছিল আরও বেশি অভিজাত ও তাৎপর্যময়। কিন্তু এই সবকিছুই এখন দুঃস্বপ্ন। বিস্তৃত উর্বর ভূমি আর খনিজ সম্পদের অবারিত উৎস আগ্রাসি চীনের লোলুপ দৃষ্টিতে ফেলে দেয় এই ভূখণ্ডকে। লালসা নিবারণ করতে গিয়ে চীন কেবল ভূখণ্ডটি দখল করেই ক্ষান্ত হয় না; বরং অঞ্চলটির ভূমিপুত্র উইঘুর ও কাজাখ মুসলিমদের জাতীয় পরিচয়কে সমূলে উৎপাটন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। এ লক্ষ্যে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় হাজার হাজার মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র; নির্মমভাবে হত্যা করা হয় লক্ষাধিক মুসলিম নেতা, ধর্মীয় স্কলার ও সাধারণ মানুষকে। বুরহান শহিদী নামে তৎকালীন পূর্ব তুর্কিস্তানের এক গভর্নরের ভাষ্য—'১৯৫২ সালে এক বছরেই চীন পূর্ব তুর্কিস্তানের ১ লাখ ২০ হাজার মুসলিমকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে, যাদের বেশিরভাগই ছিলেন আলেম-ওলামা ও মুসলিম স্কলার। এক পরিসংখ্যান মতে, দখলের পর থেকে চীনের হাতে এই অঞ্চলের যত মানুষ নিহত হয়েছে, ইরাক আফগানিস্তান চেচনিয়া বসনিয়া ও ফিলিস্তিনে নিহত মানুষের মোট সংখ্যার চেয়ে তা কয়েকগুণ বেশি।

৯/১১ পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার অন টেরর মডেলের মধ্য দিয়ে চীন এই নৃশংসতার বৈধতা খুঁজে নেয়। ফলে উইঘুর মুসলিমদের জাতিগত নিধনের মাত্রা পূর্বের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি গতি পায়। এ সময়ে চীনের পাশবিক নৃশংসতা

ইতিহাসের সকল নিষ্ঠুরতাকে হার মানাতে থাকে। চীনের এই নিধনযজ্ঞ কোনো এলোপাথাড়ি উত্তেজনার অংশ নয়; বরং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পদ্ধতিগতভাবে চলছে এই মিশন। কিন্তু মানবতার ধ্বজাধারী বিশ্বমোড়লরা মানবতা রক্ষার দোহাই দিয়ে ইরাক, সিরিয়া, আফগান ও ইয়েমেনে মুসলিমদের ওপর গণহত্যা চালাতে পারলেও তাদের মানবতা পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের ওপর চালানো চীনের সিস্টেমেটিক জেনোসাইডকে রুখে দিতে ভূমিকা রাখছে না সামান্যও। কদাচিৎ অবশ্য বিশ্বনেতাদের দেখা যায় পূর্ব তুর্কিস্তানে চীনের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে দু-চারটে কথা বলতে; তবে সেটা মূলত আধিপত্যের লড়াইয়ে চীনকে খানিক কোণঠাসা করার চেষ্টা মাত্র। আসলে চীনের আগ্রাসি উইঘুর নীতিতে পশ্চিমেরও যে ভূমিকা আছে, সেটা লুকোনোর উপায় কী? লেখক শন রবার্টস যথারীতি এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন এই বইয়ে।

সত্যিকারার্থে, আমার সমস্যা আমার প্রতিপক্ষ এসে সমাধান করে দেবে—এই চিন্তা কোনো বোকাও করে না। আসলে আমাদের সমস্যা আমাদেরকেই সমাধান করতে হবে। সেক্ষেত্রে সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানতে হবে আগে। বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের সমস্যাগুলো নিয়ে সচেতন এমন একটা প্রজন্ম যত দিন তৈরি না হবে, তত দিন এই জাতির মুক্তি নেই। সেক্ষেত্রে সমস্যার গভীর পাঠ ও পর্যবেক্ষণ জরুরি। ‘আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড’ সিরিজ নামে এই সিরিজে মূলত আমরা এই লক্ষ্যেই কাজ করব—আক্রান্ত মুসলিম ভূখণ্ড ও সেখানকার নিপীড়িত মুসলিমদের সমস্যাগুলোর গভীর পাঠ ও পর্যবেক্ষণ। এক্ষেত্রে প্রতিটা বিষয়বস্তুর ওপর লেখা একাধিক বইপত্রের মধ্যে সবচেয়ে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বইগুলো খুঁজে বের করে বাঙালি মুসলমানদের হাতে তুলে দেব ইনশাআল্লাহ। আশা করি এভাবেই আমাদের মধ্যে একটি প্রজন্ম তৈরি হবে, যারা বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের সমস্যাগুলো নিয়ে পূর্ণমাত্রায় সচেতন এবং মুসলিমদের জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ হবে।

বইটির লেখক শন রবার্টস উইঘুরদের নিয়ে গবেষণা করছেন ৩০ বছরের বেশি সময়। ১০ বছর গবেষণা উপলক্ষ্যে মধ্য এশিয়ায় বসবাস করেছেন তিনি। চীনের সাথে পূর্ব তুর্কিস্তানের দ্বন্দ্বের একেবারে সূচনাকাল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত পুরো চিত্রটা স্পষ্ট করে তুলেছেন এবং বিশেষ করে ৯/১১ পরবর্তী সময়ে চীনের ধ্বংসাত্মক উইঘুর নীতির পেছনে আমেরিকার ওয়ার অন টেরর প্রজেক্টের যে অপরিসীম ভূমিকা, তা মোটেও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। ফলে আশা করি, ভাগ্যহত উইঘুর মুসলিম ও পূর্ব তুর্কিস্তানে চীনের আগ্রাসন সম্পর্কে জানতে এই বই হবে উত্তম বিকল্প।

আবদুর রহমান আদ-দাখিল
০৭/১১/২০২৪

সম্পাদকের বাণী

শিনচিয়াং—উইঘুর জন্মভূমি। একসময়কার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এই ভূখণ্ড আজ এক উন্মুক্ত কারাগার। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে নাইন-ইলেভেন অবধি সেখানে চীনা উপনিবেশ কর্তৃত্ব বিস্তার করে। দুইবার স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেও স্বাধীনতা রক্ষা সম্ভবপর হয়নি। নাইন-ইলেভেনের পর চীনা ঔপনিবেশিক শাসন আমেরিকা প্রণীত গ্লোবাল ওয়ার অন টেরোরিজমের ফর্মুলায় আনুষ্ঠানিকভাবে উইঘুর নির্মূল কর্মসূচিতে পরিবর্তিত হয়। বৈধতা পায় সকল অত্যাচার-অনাচার। উইঘুরদের সামগ্রিকভাবে 'সন্ত্রাসী' হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। নিজেদের স্বার্থে মার্কিনীরাও এই সবকিছুর অনুমোদন দিয়ে উইঘুর নিধনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে। ফলাফলস্বরূপ শিনচিয়াংয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের আবির্ভাব হয়েছে। তারা আঞ্চলিক সংঘাতে সুবিধা করতে বৈশ্বিক সংঘাত থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের দিকেও মনোযোগী হয়েছে। সর্বোপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উইঘুরদের ওপর চলমান নিয়মতান্ত্রিক ধ্বংসযজ্ঞের দায় এড়াতে পারে না।

শন আর. রবার্টস এই বইটিতে উইঘুর ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান সংকটের খুঁটিনাটি তুলে ধরেছেন। পাঠকের সুবিধার্থে বাংলা অনুবাদে পরিশিষ্ট আকারে সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে চীনের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে লেখক শিনচিয়াংয়ের পাশাপাশি অন্যান্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী শাসন বিষয়েও বিশ্ববাসীকে সতর্ক করেছেন। তারা আজ উইঘুরদের জন্য এলেও কাল হয়তো আমরাই হব তাদের পরবর্তী শিকার। তাই উইঘুর নিয়ে রচিত হলেও এই বইয়ে মুসলিম-বঙ্গের পাঠক নিজেদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সচেতন হবেন বলে আমি আশাবাদী। উদ্যমী তরুণ আশফাক রেশাদের অনুবাদে পাঠকের ভবিষ্যৎ চিন্তার নতুন দ্বার উন্মোচিত হোক।

মোস্তফা আল হোসাইন আকিল
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অনুবাদকের অভিব্যক্তি

সকল প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু তায়ালার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সাথিগণের ওপর।

চীন এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর মাঝে অবস্থিত কাশগড় অঞ্চল এবং সেখানকার ভূমিপুত্র উইঘুরদের ওপর চীনা নির্মমতার কথা আমরা অনেকেই জেনে থাকব। এই বিষয়ে বাংলা ভাষায় সম্প্রতি বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু ঠিক কী কারণে বা কোন অজুহাতে উইঘুর মুসলিমদের ওপর চীন সরকার এই বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে, সেটা সম্পর্কে আমরা অনেকেই জ্ঞাত নই। এজন্যই মূলত উইঘুর সংকট বিষয়ে অসংখ্য বই থেকে শন রবার্টসের 'The War on the Uyghurs: China's Internal Campaign Against a Muslim Minority' বইটি আমি অনুবাদের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য কোনো মতাদর্শিক, না-কি শুধুই অর্থনৈতিক কারণে চীন উইঘুরদের আবাসভূমি দখল করে রেখেছে; প্রধানত এই কারণটিই খুঁজে দেখতে চেয়েছেন লেখক শন রবার্টস।

উইঘুরদের নিয়ে সেই নব্বইয়ের দশক থেকে কাজ করার সুবাদে তিনি বেশ কয়েকবার উইঘুরদের আবাসভূমি পূর্ব তুর্কিস্তান ভ্রমণ করেছেন এবং সেখানে চলমান পরিবর্তনগুলো স্বচক্ষে দেখেছেন। বইটিতে লেখক এ অঞ্চলের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা তুলে আনার মাধ্যমে বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তনগুলোর সাথে ঐতিহাসিক কার্যকারণের এক দারুণ মেলবন্ধন তৈরি করেছেন।

বহির্বিশ্বের রাজনীতির সাথে উইঘুর সমস্যা কীভাবে জড়িত, সেটাও তিনি সিদ্ধহস্তে তার বইতে বিশ্লেষণ করেছেন। সন্ত্রাসবাদের সাথে উইঘুরদের জড়িত থাকার অজুহাতে চীনের দমন-পীড়ন বিষয়ে লেখক বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ৯/১১ এর বহু আগে থেকে চীনের এই দমন-পীড়নের কার্যক্রম চলমান থাকলেও একে বৈধতা দেওয়ার জন্য ৯/১১ এবং আমেরিকার ওয়ার অন টেররকে একটি বিশেষ হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন এবং উইঘুরদের সাথে তালেবানের সম্পর্কের অভিযোগে চীনের দমন-পীড়ন নতুন মাত্রা পায়। এই প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি বইটিতে

তুলে ধরা হয়েছে—কমিউনিস্ট বিপ্লবের সময়ে পূর্ব তুর্কিস্তানের সামগ্রিক পরিস্থিতি, উইঘুর রাষ্ট্র ও সরকার গঠন এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ।

২০১৯ সালে করোনা মহামারির সময় চীন উইঘুর অঞ্চলে বিশেষ ভ্রমণ-নিষেধাজ্ঞা জারি করে। সাংবাদিকদেরকেও উইঘুরে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। এই প্রতিকূলতার মাঝেও লেখক শন রবার্টস উইঘুরদের ওপর করোনা মহামারি কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, সেটা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। উইঘুরদের জন্য চীনের তৈরি করা তথাকথিত 'রি-অ্যাডুকেশন' ক্যাম্পগুলোতে উচ্চ নিরাপত্তাব্যবস্থার কারণে সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ ছিল খুবই কঠিন। লেখক রবার্টস সেই কাজটি খুব ভালোভাবেই করতে পেরেছেন।

তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন সংজ্ঞায়নের ভিড়ে শুরুর দিকে বইটি সহজপাঠ্য না-ও মনে হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের আলোকে ধীরে ধীরে বইটি পাঠক উপলব্ধি করতে পারবে বলে আমি আশাবাদী। বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের মনোভাব, তার ভাষাগত কাঠামো এবং মূল টেক্সটের সাথে যথাসম্ভব মিল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে বহুল প্রতীক্ষার পর বইটি প্রকাশিত হওয়ায় আল্লাহ তায়ালার নিকট অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বইটির সম্পাদনায় শ্রম দেওয়ায় আবু বকর সিদ্দিক ভাইকে আল্লাহ তায়ালা কবুল করুন। বইটি যাতে জুলুমের শিকার উইঘুর মুসলিমদের প্রকৃত অবস্থা বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করে—এই আশা রাখি। আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার জমিনের প্রতিটি কোণে জালিমের গ্রাসে থাকা আমাদের ভাই-বোনদের মুক্তি ত্বরান্বিত করুন, আমাদের পরীক্ষা সহজ করুন।

-নিবেদক

আশফাক রেশাদ

ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক

ঔষধবিজ্ঞান বিভাগ

ভূমিকা

সম্প্রতি, বিশেষ করে গত দুই বছরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পূর্ব-তুর্কিস্তানে উইঘুরদের উপর কর্তৃত্ববাদী চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অনবরত নিপীড়নের দিকে আলোকপাত করছে।[১] এই প্রাচীন সম্প্রদায়কে চীন তার রাষ্ট্রের একচেটিয়া শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কথিত রি-এডুকেশনের নামে বন্দীশিবিরে আটকে রাখার মাধ্যমে পুরো উইঘুর জাতিকে সম্মিলিতভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। প্রায় দশ থেকে ত্রিশ লাখের মতো উইঘুর মুসলিমকে গুম করা হয়েছে। চীন সরকারের দাবি হলো, পূর্ব-তুর্কিস্তানের মুসলিম জনগোষ্ঠী থেকে উগ্রবাদ নির্মূলের জন্য এসব রি-এডুকেশন সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। বাস্তবতা হলো, রি-এডুকেশন সেন্টারের আড়ালে এই বন্দীশিবিরগুলো চীনা রাষ্ট্রযন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেখানে চলমান নির্যাতন, গুম, জোরপূর্বক বন্ধ্যাকরণের সন্দেহাতীত প্রমাণ রয়েছে। তাদের এই কার্যক্রম মানচিত্র থেকে স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে উইঘুরদের পরিচয় মুছে ফেলার একটি বিস্তৃত ষড়যন্ত্রের অংশ।

আমি জাতিসংঘে মানবাধিকার এবং কাউন্টার টেরোরিজম বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক। কাজের সূত্রে বিভিন্ন দেশে চরমপন্থা মোকাবিলায় ব্যবহৃত পন্থাগুলো আমি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। আমি ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্য, সুইডেন, সৌদি আরবের মতো দেশে উগ্রবাদ মোকাবিলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিরীক্ষা করেছি। তাদের কাউকে আমি একটি সম্পূর্ণ সম্প্রদায়ের উপর পাইকারি দমনপীড়ন চালাতে দেখিনি। শুধুমাত্র জাতিগত এবং ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে নিরপরাধ মানুষদের গণবন্দীশিবিরে আটক করে রাখার কোনো দৃষ্টান্ত আমার চোখে পড়েনি। শিনচিয়াংয়ে যা হচ্ছে, তা কোনোভাবেই বৈধ সন্ত্রাসদমন কৌশল নয়। একটি জনগোষ্ঠীর উপর সম্মিলিত এই আক্রমণ নিশ্চিতভাবেই মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। উল্লেখ্য, সমগ্র সম্প্রদায়ের উপর গভীর মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতসৃষ্টিকারী এসব কৌশল কখনোই সফল হয় না। বরং এগুলো কাউন্টার-প্রোডাক্টিভ এবং মানুষকে চরমপন্থী মতাদর্শের দিকে আরো জোরালোভাবে ধাবিত করে।

---

১ পূর্ব-তুর্কিস্তানে তথা Xinjiang সরকারিভাবে 'শিনচিয়াং উইঘুর স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল' নামে পরিচিত। চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত শিনচিয়াং চীনের বৃহত্তম প্রশাসনিক বিভাগ। এর আয়তন ১৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি জাতিগত নিধনের জন্য সন্ত্রাসবাদকে একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে মাত্র। কমিউনিস্ট পার্টি নির্মিত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে পরিকল্পিতভাবে বন্দীদের মনোবল গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতা সেখানে পুরোপুরি বিলুপ্ত। তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ধাপ কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ করে। কোথায় তারা বসবে, কখন তারা কথা বলতে পারবে কিংবা কখন পারবে না ইত্যাদি সবকিছুই। এসবের কোনো ব্যত্যয় ঘটলেই তাদের উপর নেমে আসে অমানুষিক শাস্তি। বন্দীদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার, নিজস্ব ধর্ম পালন অথবা নিজস্ব সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রকাশ পেতে পারে এমন যেকোনো কার্যকলাপ সেখানে পুরোপুরি নিষিদ্ধ। তারা বহির্বিশ্ব থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। মাসের পর মাস কিংবা বছরের পর বছর বন্দীদশার পর কর্তৃপক্ষ চাইলেই কেবল কারো মুক্তি মিলতে পারে। মুক্তি পাবার জন্য তখনই তারা উপযুক্ত হয়, যখন তারা প্রমাণ করতে পারে যে তারা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে হান চীনা সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে।

শিনচিয়াংয়ে ঐতিহাসিক উইঘুর সমাধিস্থল এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এগুলোই সাংস্কৃতিক নিধনের বৈশিষ্ট্য, যার উদ্দেশ্য জাতিগত, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে একটি স্বতন্ত্র পরিচয়কে ধ্বংস করা।

এতোকিছুর পরও চীন এখনো পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সব ধরনের কার্যকরী আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। কারণ তারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে সাক্ষরই করেনি! তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের উপর মানবাধিকার বিষয়ে কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করতে পারছে না। তবে চীনা কর্তৃপক্ষের মানবতাবিরোধী অপরাধ নিয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তারা বেসামরিক জনগণের উপর ব্যাপক ও একটি পদ্ধতিগত আক্রমণাত্মক অভিযান পরিচালনা করছে। তাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য যেকোনো উপায়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

সম্প্রতি কিছু পশ্চিমা রাষ্ট্র জাতিসংঘে উইঘুরদের উপর চলমান নিপীড়নের নিন্দা জানিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীও দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে বিষয়টি তুলে এনেছেন। পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথিত ম্যাগনিটস্কি আইনের মাধ্যমে চীনা কর্মকর্তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা চলছে। যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য দেশগুলোকেও ম্যাগনিটস্কি আইন জরুরিভাবে অনুসরণ করতে হবে।

যারা উইঘুরদের বিরুদ্ধে চীনের এই অনন্ত যুদ্ধ ও মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন এবং এই নৃশংসতার পটভূমি জানতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য শন আর. রবার্টসের এই বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বইটিতে উইঘুর জাতীয়তাবাদের ইতিহাসকে সূচনালগ্ন থেকে তুলে আনা হয়েছে। উইঘুরদের উপর এই নৃশংসতাকে ন্যায্যতা

দিতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির উত্থাপিত মিথগুলোকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সর্বোপরি প্রকৃত বাস্তবতা উন্মোচন করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি আশাবাদী, বইটি বিশ্বব্যাপী নীতি-নির্ধারকদের জন্য একটি ওয়েক-আপ কল (wake-up call) হবে। পূর্ব-তুর্কিস্তানের নিকট অতীতের বিশদ বিশ্লেষণ এবং বর্তমানের দৃশ্যমান প্রমাণগুলো সামনে আসার পরেও বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো অজুহাত থাকতে পারে না। শন রবার্টস বিশুদ্ধ পটভূমি তুলে এনেছেন, চীনের মিথ্যা অজুহাতকে খণ্ডন করেছেন, চীনা নিপীড়নের বাস্তবতা উন্মোচন করেছেন। তাই কারো পক্ষে এই বাস্তবতা অস্বীকার করা সম্ভব হবে না।

বেন এমেরসন

জাতিসংঘে কাউন্টার টেরোরিজম বিষয়ক সাবেক বিশেষ প্রতিবেদক এবং রুয়ান্ডা ও সাবেক যুগোস্লাভিয়ায় জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক বিচারক।

লেখকের কথা

বিশ্বকে হঠাৎ গ্রাস করা কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বইটির প্রকাশে কিছুটা বিলম্ব হয়। তবে এই দেরি হওয়া আমার জন্য শাপেবর হয়েছে। বিশ্বব্যাপী সংকটময় এই মুহূর্তে এই বিলম্ব আমাকে চীনের উইঘুরদের পরিস্থিতি সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহের একটি সুযোগ করে দেয়। এসময় স্থানীয় ও বৈশ্বিক রাজনীতির প্রভাব চীনের ভেতরে উইঘুরদের ভাগ্যকেও প্রভাবিত করেছে। উইঘুরদের উপর চালানো সাংস্কৃতিক নিধনের সাথে গ্লোবাল ওয়ার অন টেরর যেমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তেমনি কোভিড-১৯ মহামারিও উইঘুরদের ভাগ্যকে নির্দিষ্ট রূপদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তবে চীনের অভ্যন্তরে উইঘুরদের জনস্বাস্থ্যে এই কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব জানার কোনো উপায় নেই। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে উহানে কোভিড-১৯ এর আবির্ভাবের পর উইঘুর অঞ্চল থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য আসা প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। প্রথমত, কঠোর লকডাউনে থাকা চীনের মতো দূরবর্তী একটি দেশ থেকে স্বভাবতই সঠিক তথ্য পাওয়া অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। দ্বিতীয়ত, চীন ২০২০ এর বসন্তে সাংস্কৃতিক নিধন নিয়ে কাজ করা নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এবং ওয়াশিংটন পোস্টের মতো আন্তর্জাতিক মিডিয়ার বিশিষ্ট সাংবাদিকদের তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনা সাংবাদিকদের উপর বিভিন্ন বিধিনিষেধের প্রতিশোধ হিসেবে এমনটা করা হয়েছিল, তবে এর কারণে উইঘুরদের উপর চীনের বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে তদন্ত কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। সর্বোপরি, এসময় বিশ্ববাসীর মনযোগ উইঘুরদের থেকে বরং মহামারির দিকেই বেশি কেন্দ্রীভূত ছিল।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়, প্রায় ১০ লাখের মতো উইঘুর কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। বইটির ভূমিকা লেখার সময় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচারিত কোভিডে আক্রান্ত ও মৃত উইঘুরের সংখ্যা বলা হয়েছে যথাক্রমে ১০০ ও ৫ এর-ও কম। চীন সরকার বহু আগে থেকেই উইঘুরদের সম্পর্কে বানোয়াট এবং বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করে আসছে। তাই এ পরিসংখ্যানে বিশ্বাস করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। স্বাভাবিকভাবেই জনাকীর্ণ কারাগারে উইঘুর জনগোষ্ঠী এই ভাইরাসের সংক্রমণে ব্যাপক স্বাস্থ্যঝুঁকির সম্মুখীন হয়েছে এবং এর প্রকৃত চিত্র আমরা সম্ভবত কখনোই জানবো না।

২০২০ এর মে মাস অবধি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এটা নিশ্চিত যে, কোভিড-১৯ মহামারীর সুযোগে উইঘুরদের উপর চীনের সাংস্কৃতিক নিধনকে স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মহামারির প্রথম মাসেও উইঘুরদের পারিবারিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা, জোরপূর্বক উচ্ছেদ এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের মতো বিষয়গুলো ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এজন্য বিশেষভাবে উইঘুর শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয় এবং হান বসতিগুলোকে উইঘুর এলাকায় যেতে উৎসাহিত করা হয়। এসবের মাধ্যমে চীন উইঘুরদেরকে তাদের নিজস্ব অঞ্চল থেকে স্থানান্তরিত করে তাদের সামগ্রিক পরিচয়কে ধ্বংস করার এক নতুন অভিযান শুরু করেছে। কোভিড মহামারির উন্নতি হলে সাংবাদিকরা যখন উইঘুর অঞ্চলগুলোতে যাবে, তখন তারা হিসাব মেলাতে ব্যর্থ হবে। এই মহামারি উইঘুরদের বিরুদ্ধে একটা ধূম্রজাল হিসেবে কাজ করবে, যেখানে উইঘুরদের আগের এবং পরের পরিস্থিতির কোনো মিল থাকবে না।

২০২০ ফেব্রুয়ারির শেষদিকে চীনের কিছু উইঘুর নীতি ফাঁস হয়। করোনা মহামারির কারণে চীনে যখন লকডাউন চলছিল, তখন চীনের অর্থনীতি সচল রাখতে উইঘুর শ্রমিকদের কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। অথচ তখন চীনের অন্যান্য অঞ্চল কঠোর লকডাউনের আওতায় ছিল। চীনের বাইরে নির্বাসিত অগণিত উইঘুর এসময় সোশ্যাল মিডিয়ায় এরকম বিভিন্ন ভিডিও পোস্ট করে। ভিডিওতে স্যুটকেস হাতে এবং মুখে মাস্ক পরা অগণিত উইঘুরদের কোথাও নিয়ে যেতে দেখা যায়। দেখে মনে হচ্ছিল, সবাইকে কারখানায় কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চীন প্রচার করে, এই কাজের জন্য উইঘুরদের উপর কোনোপ্রকার চাপ প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু সত্য হলো, কেউ এই কার্যক্রমে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানালে তাদেরকে ভয়ঙ্কর নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হয়।

বহির্বিশ্বের পর্যবেক্ষকদের কাছে এই শ্রম কর্মসূচিকে উইঘুরদের ক্যাম্পে রেখে নির্যাতন চালানোর চেয়ে কম সহিংস এবং বেশি রুচিশীল মনে হয়। অথচ এর মাধ্যমে উইঘুরদেরকে গ্রামীণ এলাকাগুলো থেকে নতুন নতুন আবাসিক কারখানায় কাজ করার জন্য জোরপূর্বক স্থানান্তর করা হচ্ছে। এভাবে একসময়ের জনবহুল উইঘুর গ্রামীণ জনপদ জনশূন্য হয়ে পড়ছে। এছাড়াও উইঘুর সংস্কৃতিকে নির্মূল করতে তারা তাদের পারিবারিক বন্ধনকে ভেঙে দিচ্ছে। উইঘুরদের উপর চাইনিজ ভাষা এবং সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর এটাকে চীনারা 'রি-এডুকেশন' বলে চালিয়ে দিচ্ছে।

কারাগার এবং নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে উইঘুর অঞ্চলে যেকোনো ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলার সুযোগকে মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে চীন উইঘুরদের পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং তাদের স্পৃহাকে নিভিয়ে দিয়েছে। অধিকাংশ উইঘুর বুদ্ধিজীবীদের কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। গ্রামীণ উইঘুর জনগোষ্ঠীকে একঘরে করে রাখা হয়েছে। অগণিত উইঘুরকে

নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে। উইঘুরদেরকে চীনের অভ্যন্তরেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় এমনভাবে স্থানান্তর করা হয় যে তারা আর কোনোদিনই তাদের পরিবারের সাথে মিলিত হতে পারে না। উইঘুর অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত তথ্য বলছে, চীন উইঘুর পরিচয়কে ধ্বংসের জন্য একের পর এক কঠিন পদক্ষেপ নিচ্ছে। তারা প্রাপ্তবয়স্কদের নির্বাসিত করে আবাসিক ফ্যাক্টরিগুলোতে কাজে লাগাচ্ছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু ও শিক্ষার্থীদেরকে তারা পরিবার এবং সমাজ থেকে আলাদা করে আবাসিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করছে। এজন্য উইঘুরদের পরবর্তী প্রজন্ম নিজেদের মধ্যে খুব কমই উইঘুর সাংস্কৃতিক পরিচয় বহন করবে।

মহামারি শুরু হওয়ার পর থেকে চীন অন্য অঞ্চলের বাসিন্দাদের উইঘুরের দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত কম ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য ভর্তুকি দিচ্ছে। যদিও এই প্রোগ্রামটি এখন পর্যন্ত কতোটুকু বিস্তৃত হয়েছে, তা অজানা। তবে উইঘুরদের অন্য স্থানে সরিয়ে নেওয়া এবং সেখানে চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ হান সম্প্রদায়ের বসতি নির্মাণে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উপনিবেশবাদের এক নতুন অধ্যায় রচিত হচ্ছে। এটা বলা ভুল হবে না যে, কোভিড মহামারি চলাকালীন উইঘুর অঞ্চলে এই ভৌগোলিক পরিবর্তন অব্যাহত রয়েছে। আমার রায় হলো, চীন কাউন্টার টেরোরিজমের আড়ালে উইঘুর অঞ্চলে উপনিবেশবাদ কায়েম করেছে, যাতে করে বাদবাকি চীন থেকে জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিকভাবে উইঘুর অঞ্চলকে আলাদা করা না যায়। বর্তমান পরিস্থিতি নির্দেশ করে, এক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের পাল্লা বেশ ভারী। উইঘুররা যদি এসব মোকাবিলা করার সামর্থ্য রাখতো, তবে এসবের বাস্তবায়ন কিছুটা হলেও দীর্ঘায়িত হতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই মহামারি উইঘুর অঞ্চলকে হান-অধ্যুষিত অঞ্চলে পরিণত করার কার্যক্রমকে আরো সহজ করে দেবে। উপরন্তু ২০১৭ সাল থেকে উইঘুরদের উপর চলা এই সহিংস কার্যক্রমের অনেক প্রমাণ চীন মুছে ফেলতে সক্ষম হবে এবং এর মাধ্যমে উপনিবেশবাদের চূড়ান্ত অধ্যায় রচিত হবে। চীন উইঘুরদের নির্মূল করার এমন এক অভিযানে নেমেছে, যাকে জাতিগত নিধন বলা অযৌক্তিক কিছু নয়।

শন রবার্টস
১৫ মে ২০২০
ওয়াশিংটন ডিসি।

শুরুর কথা

উইঘুরেরা মূলত একটি মুসলিম জনগোষ্ঠী, যারা তুর্কি ভাষা থেকে উদ্ভুত একটি ভাষায় কথা বলে। প্রথমদিকে তারা চীনের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল। এটি বিভিন্ন সময় XUAR বা Xinjiang Uyghur Autonomous Region নামে পরিচিত ছিল। তবে উইঘুর জনগোষ্ঠী প্রায়শ এই অঞ্চলটিকে 'পূর্ব-তুর্কিস্তান' নামে উল্লেখ করতে পছন্দ করে। উইঘুর জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলকে নিজেদের জন্মভূমি বলে মনে করে। এই অঞ্চলে তাদের জনসংখ্যা এক কোটি তেরো লাখের বেশি।[১] এছাড়াও আনুমানিক পাঁচ লাখ উইঘুর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। বিশেষ করে কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান এবং তুরস্কে উইঘুর জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ বসবাস করছে। ভাষাগত দিক বিবেচনায়, সাংস্কৃতিকভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে চীনা হান জনগোষ্ঠীর চেয়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে উদ্ভুত মধ্য এশীয় দেশগুলোর সাথে উইঘুরদের অধিক মিল পাওয়া যায়।

উইঘুর জনগোষ্ঠীর সাথে ইসলামের ইতিহাস সুপ্রাচীন। আজও সংখ্যাগরিষ্ঠ উইঘুর জনগোষ্ঠী মুসলিম ধর্মাবলম্বী। তারা মূলত হানাফি মাযহাবের অনুসারী। তবে স্থানীয়দের মাঝে ইসলামি রীতিনীতির অনুশীলনে অনেক বৈচিত্র্য বিদ্যমান। এই বৈচিত্র্যের উদ্ভব এই অঞ্চলের সুফি ঐতিহ্য থেকে। যদিও উইঘুরেরা দীর্ঘদিন ধরেই মক্কায় হজ্জযাত্রা করে আসছে, তবে ইসলামের কেন্দ্র থেকে তাদের ভূমির দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামি কেন্দ্র এবং বৈশ্বিক ইসলামি আন্দোলন থেকে তারা সবসময় দূরেই রয়ে গিয়েছে। এমন অসংখ্য উইঘুর রয়েছে, যারা কট্টর মুসলিম না হলেও নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ইসলামি অনুশাসন মেনে চলে। যাইহোক, ইসলাম উইঘুরদের পরিচয় ও জাতিসত্তা গঠনে এবং

প্রভাবশালী হান চীনাদের থেকে উইঘুরদের আলাদা করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

আধুনিক উইঘুর জনগোষ্ঠী অষ্টম এবং নবম শতকে পূর্ব-তুর্কিস্তান শাসন করা এক প্রাচীন উইঘুর সাম্রাজ্য থেকে তাদের বংশগতির ধারা ব্যাখ্যা করে। তবে অধিকাংশ আধুনিক জাতিগোষ্ঠীর মতো তারাও মূলত ঐতিহাসিকভাবে বিভিন্ন সময়ে এই অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতির মিশ্রণ।[৩] বিশেষভাবে, উইঘুর জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আগমন করা বিভিন্ন তুর্কি এবং ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে। ধারণা করা হয়, তারাই উইঘুর জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ হিসেবে এই ভূখণ্ডের সবচেয়ে আদি বাসিন্দা।[৪] তাই উইঘুরদের মাঝে দৈহিকভাবেও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। এই জিনগত বৈচিত্র্যের কারণে উইঘুরদের জন্য পুরোপুরি হান চীনা হিসেবে উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন। এই বিষয়টিই উইঘুরদেরকে চীনের ভেতর আত্মীকরণের যেকোনো প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে।

বিংশ শতাব্দীর আগে একটি ঐক্যবদ্ধ উইঘুর জাতির ধারণা গড়ে ওঠেনি। দশম এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে এই অঞ্চলে তুর্কি এবং একইসাথে ইসলামের আগমনের প্রভাবে একটি একীভূত সংস্কৃতির ধারণা তৈরি হয়। এটি পরবর্তীকালে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন চিং রাজবংশ (Qing dynasty) এই অঞ্চল দখল করে, তখনো এই একীভূত সংস্কৃতি সেখানকার উইঘুরদের মাঝে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ছিল। একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে সেসময় উইঘুর নাম গ্রহণ না করলেও তারা একই ভাষা, রীতিনীতি এবং ধর্মের অনুসারী ছিল।[৫] এসব কারণে তারাই এই অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠী। কিন্তু চীনের দাবি অনুসারে উইঘুরেরা এ অঞ্চলের আদিবাসী নয়,

---

৩ For more on the ancient Uyghur Empire, see Colin Mackerras, The Uighur Empire According to T'ang Dynastic Histories: A Study in Sino-Uighur Relations, 744–840 (Columbia, SC: University of South Carolina Press, 1973).

৪ See James Millward, Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang (New York: Columbia University Press, 2007), pp. 1–77.

৫ See Laura Newby, '"Us and Them" in 18th and 19th Century Xinjiang,' in I. Beller-Hann, M. Cesàro, and J. Finley (eds), Situating the Uyghurs Between China and Central Asia (Hampshire, UK: Ashgate, 2007); BellerHann, Community Matters in Xinjiang; Thum, The Sacred Routes of Uyghur History.

বরং উইঘুর অঞ্চল সর্বদাই বৃহত্তর চীনের অংশ ছিল। এই দাবির প্রেক্ষিতেই উইঘুর এবং চীনের মধ্যকার যাবতীয় উত্তেজনা।[৬]

এই উত্তেজনা মূলত একটি প্রশ্নকে ঘিরে: এই অঞ্চলটির মালিকানা আসলে কার এবং কাকে এই অঞ্চল শাসন এবং এই অঞ্চলের জনগণের উন্নয়নের কর্তৃত্ব দেওয়া উচিত? এই প্রশ্নের জবাব অর্থাৎ চিং বা চীন রাষ্ট্র এবং উইঘুরদের ভিন্ন হওয়ার বিষয়টি এই অঞ্চলের নামকরণের দিকে লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। চিং সাম্রাজ্য যখন এই অঞ্চল দখল করে, তখন তারা এর নামকরণ করে 'শিনচিয়াং' তথা 'নতুন সীমান্ত'। এরপর ১৮৮০র দশকে যখন এই অঞ্চলকে চীনা রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হতে থাকে, তখন এই নামটিকেই এই অঞ্চলের অফিসিয়াল নাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তবে অধিকাংশ উইঘুরই তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা বা কাজে সচেতনভাবে কখনো এই নামটি ব্যবহার করে না। কারণ নামটি একটি ঔপনিবেশিক ইতিহাস বহন করে। উইঘুরদের একটি বিশাল অংশ এই অঞ্চলকে Shärki Turkistan বা পূর্ব-তুর্কিস্তান নামে ডাকতে পছন্দ করে। কারণ এটি তুর্কি ঐতিহ্য এবং ১৯৩০ এবং ৪০ এর দশকে এই অঞ্চলে দুটি স্বল্পস্থায়ী স্বাধীন রাষ্ট্রের ইতিহাসকে স্মরণ করিয়ে দেয়। চীনের ভেতরে থাকা অন্যান্য উইঘুরেরা এ অঞ্চলকে Uyghur Diyari বা উইঘুর অঞ্চল নামে অভিহিত করে। কারণ এই নামকরণের মাধ্যমে তারা এটিকে শিনচিয়াং নামে ডাকা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং একইসাথে 'পূর্ব-তুর্কিস্তান' শব্দটি ব্যবহারের কারণে চীনের বয়ান মোতাবেক 'চরমপন্থী' ট্যাগ এড়িয়ে চলে।[৭]

এই ভূখণ্ডের নামকরণ নিয়ে দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের বিষয়টিই উইঘুর এবং পিপলস রিপাবলিক অফ চায়নার মাঝে দীর্ঘ উত্তপ্ত সম্পর্ককে নির্দেশ করে। ঐতিহাসিকভাবে এই সংঘাতের তীব্রতা বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে। কখনো কখনো সাধারণ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, আবার কখনোবা সহিংস সংঘাত দেখা দিয়েছে। তবে চিং সাম্রাজ্য এই অঞ্চলকে দখলে নেওয়ার পর এই সংঘাত ধারাবাহিকভাবে সর্বদাই কোনো না কোনো মাত্রায় উপস্থিত ছিল। বইটিতে এসবের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও এই বইটির একটি কেন্দ্রীয় বক্তব্য হিসেবে নাইন-ইলেভেন হামলার পর চীনা শাসনের বিরুদ্ধে উইঘুরদের প্রতিরোধকে 'সন্ত্রাসী হুমকি' হিসেবে চীনের চিহ্নিত করার বিষয়টিও আলোচনা করা হয়েছে।

---

৬ For official government accounts of the history of the XUAR and the Uyghurs, see State Council Information Office of the PRC (SCIOPRC), Full Text of White Paper on History and Development of Xinjiang (26 May 2003); White Paper: Historical Matters Concerning Xinjiang (22 July 2019).

৭ Personal communication with Elise Marie Anderson, 2019.

প্রথম অধ্যায়

কলোনিয়ালিজম (১৭৫৯-২০০১)

গ্লোবাল ওয়ার অন টেররের আদলে কাউকে 'টেরোরিস্ট' আখ্যা দেওয়ার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। এক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো যৌক্তিক অভিযোগ উপস্থাপনের প্রয়োজন পড়ে না। ব্যক্তি এখানে এমন এক অযৌক্তিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত, যেটি ইসলামের চরম ও অসহিষ্ণু ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এজন্য ওয়ার অন টেররকে সামনে এনে আধুনিক চীনা রাষ্ট্রের সাথে উইঘুরদের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের বিষয়কে আড়াল করে রাখা হয়েছে। কিন্তু এখানে ইসলামি চরমপন্থা চিংবা সন্ত্রাসবাদের চাইতে উইঘুর জনগোষ্ঠীর সাথে চীনের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের বিষয়টি উপলব্ধি করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। উইঘুর জনগোষ্ঠী এবং চীন রাষ্ট্রের মধ্যকার বৈরী সম্পর্কের ঐতিহাসিক কারণকে উপলব্ধি করতে এই অধ্যায়টি সহায়ক হবে (এসব কারণকে সন্ত্রাসবাদ জুজুর মাধ্যমে আড়াল করে রাখা হয়েছে)।

উইঘুর এবং চীনের মধ্যকার বৈরী সম্পর্কের শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে চিং সাম্রাজ্য কর্তৃক উইঘুর অঞ্চল দখলে নেওয়ার মাধ্যমে। তখন থেকে ২০০১ সালে গ্লোবাল ওয়ার অন টেরর শুরু হওয়া পর্যন্ত উইঘুর জনগোষ্ঠী এবং চীনা রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কটি মোটাদাগে উপনিবেশবাদের। এই উপনিবেশবাদ সর্বদাই উপস্থিত ছিল এবং এখনো চলমান রয়েছে।

উইঘুর এবং আধুনিক চীনের সম্পর্ককে উপনিবেশবাদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা নিয়ে অ্যাকাডেমিক সার্কেলে কিছু বিতর্ক রয়েছে। যেমন, চিং সাম্রাজ্য বিষয়ক বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ জেমস মিলওয়ার্ড সম্প্রতি এই ঔপনিবেশিক ব্যাখ্যা থেকে সরে এসেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, সেই উপনিবেশবাদ এবং তৎকালীন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ইউরোপীয় উপনিবেশবাদের মাঝে বিভিন্ন ভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া হান